বটবৃক্ষে তেলাপিয়া

মোশাররফ খান

কাল ছিল অমাবস্যা, সন্ধ্যাভর গেল কালবৈশাখীর তাণ্ডব আর সারা রাত ধরে অঝোর বর্ষণ। প্রতিদিনের মত কাকভোরে বটমূলে পুজো দিতে এসে একেবারে দোলন বৌয়ের বিস্ফারিত চোখের সামনেই ঘটে গেল এই অদ্ভুত কাণ্ড। বিশাল বটের গুঁড়ি বেয়ে নেমে আসা জলের স্রোতের সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে এক জোড়া ছটফটে তেলাপিয়া। চকচকে সোনালি আঁশে মোড়া ডিমভরা হলুদ পেট কাত হয়ে শুয়ে, থেকে থেকে লেজ নেড়ে খেলছে তারা একেবারে দোলন বৌয়ের পায়ের কাছে। বিস্ফারিত চোখে কম্পিত হৃদয়ে এক স্বর্গীয় অনুভবে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে দোলন বউ। তার মনে একটা তাৎক্ষণিক বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠে – নিশ্চয়ই এই তেলাপিয়া ঈশ্বরপ্রেরিত এবং অলৌকিক কোন নিগূঢ় ইঙ্গিতের বাহন। সবার অলক্ষ্যে কোঁচড়ে জড়িয়ে পরম স্নেহে তাদের ঘরে নিয়ে যায় দোলন বৌ।

প্রতিদিনের ধরাবাঁধা শাকান্নের পাতে আজ সযত্নে সাজানো তেলাপিয়ার ব্যাঞ্জন দেখে অবাক হয় রমেন হালদার।

- কিরে দোলন, মাছ কোথা পেলি আজ?

- মাছ নয়, মাছ নয়, বল ঠাকুরের প্রসাদ! স্বয়ং ভগবান পাঠিয়েছেন গো!

সব শুনে রমেন তো হেসে কুটিকুটি।

- তুই যে কী বলিস দোলন, বটগাছে আবার তেলাপিয়া আসে কোথা থেকে?

- বিশ্বাস হয় না বুঝি? দেখবে তো কাল এসো ভোরে আমার সাথে বটমূলে।

সপ্তাহ না ঘুরতেই একদিন দোলন বউ রমেনকে আড়ালে ডেকে বলে,

- বলেছিলাম না এই তেলাপিয়া আমার ঠাকুরের আশীর্বাদ? এই দেখ এখানে, ওরা এসে গেছে। বলে রমেনের হাত টেনে নিয়ে তলপেটে ছোঁয়ায়।

- এখানে আছে, আমি জানি।

- বলিস কি দোলন! তবে যে ডাক্তার বদ্যিরা বলে তোর ছেলেপুলে হবে না কোনদিন!

অপলক চোখে রমেন চেয়ে থাকে দোলন বৌয়ের দিকে। রমেনের সহসা মনে হয় এ যেন অন্য কোন দোলন। রাতারাতি যেন তার শারীরিক ভূগোল বদলে গেছে। দোলনের শুভ্র স্নিগ্ধ শীর্ণ দেহটি ঘিরে রেখেছে অপূর্ব মাতৃত্বের ছায়া। এক অদ্ভুত শিহরণ নাড়া দিয়ে যায় তার সমস্ত অস্তিত্ব। দোলন কি তাহলে সত্যিই মা হতে চলেছে?

সখী শোভনা সুন্দরী সেই কখন থেকে পিছু নিয়েছে। সকাল থেকে ঘুরঘুর করছে পায়ে পায়ে। কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে চলেছে সমানে।

- লোকের মুখে কত কী শুনি। বটবৃক্ষ নাকি তোদের বর দিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার উজাড় করে? আমায় বুঝি বলবিনে দোলন?

প্রিয় সখীর কন্ঠে অভিমান। তারপর দোলনের শরীরের দিকে চোখ পড়তেই চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে যায় শোভনার। হৈ হৈ করে উঠে সে।

- কিলো মাগী, পেট বানালি কবে? তুই না বাঁজা?

- চুপ চুপ, পোড়ারমুখী, চেঁচামেচি করিসনে, আয় বলি তোকে!

সইকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায় দোলন। বটমূলে তেলাপিয়ার আবির্ভাব থেকে পরবর্তীতে ঘটে যাওয়া যাবতীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বলে সখী শোভনাকে।

- তুই আমার প্রাণের সই। কথাটা রাষ্ট্র করিসনে ভাই! দিব্যি রইল আমার।

- যাহ্, এসব কি রাষ্ট্র করার কথা?

- ঘরে আছিসনিকো দোলন মা! একদিন সকালে দাওয়ায় এসে হাঁক ছাড়ে অশীতিপর বৃদ্ধা রমলা দাসী। বুড়ির নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, নইলে এই সাত সকালে এমন সোহাগী ডাক কেন? দাওয়ায় বেরিয়ে আসে দোলন বৌ।

- রমু মাসি যে! কি মনে করে, এদিকে যে বড় আস না আজকাল?

- কোতাও কি যাতি পারি রে? বাতের ব্যথায় শরীল জরজর। হাটতি চলতি পারিনে। তোর কাচে কি মলম আচে দোলন? একটু মালিশ করে দিবি মা?

তো এই হলো আসল কথা। রমু মাসির জন্য দোলন বৌয়ের মনটা অসীম মমতায় ভরে উঠে। রমলা দাসীকে একটি জলচৌকিতে বসিয়ে তার হাড্ডিসার বুকে পিঠে আর্শ্চয মলমের মালিশ লাগায় বড় যত্নের সাথে। আরামে চোখ বুজে আসে বুড়ির। দোলনের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে -

- সেদিন শোভনা যে কইলে তোর কাচে দেবতার বর টর কি এয়েচে। আমার বাতের ব্যাথাটা সেইরে দে না মা!

- সামনের মঙ্গলবার বৈশাখী অমাবস্যা। ভোরের বেলা বট মূলে এসো একা। দাওয়াই দেবনে। দোলনের মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে যায় কথাগুলো কোন চিন্তাভাবনা না করেই। রমলা দাসীর ফোকলা দাঁতের ফাঁকে চিকচিক করে প্রত্যাশার হাসি।

রমেনদের পৈত্রিক সম্পত্তি বলতে তেমন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। শুধু আড়াই বিঘে জমি জুড়ে এই বিশাল বটের ঘন অরণ্য। আশে পাশে দু'এক চিলতে চাষের জমি, তার সাথে লাগোয়া এই এতটুকু বসত বাটি। রমেন আর দোলনের ছোট্ট সংসারে অভাবের টানাপোড়েন লেগেই আছে বছর ভর। বিত্তবানদের নজর পড়ে আছে এই জমিটুকুর উপর। প্ররোচনা, লোভ-লালসার হাতছানি, ভয়ভীতির আস্ফালন সবই আছে। তবুও শত অভাব-অনটনেও এই আড়াই বিঘের উপর কখনো হাত দেয়নি রমেন হালদার।

স্বর্গীয় পিতৃদেব বলে গেছেন — এ আমাদের সাত পুরুষের আদর-সোহাগে পালিত বট। এই প্রাচীন বটের বিশাল দেহের চড়াই-উৎরাইয়ে, বৃক্ষকাণ্ডের খানা-খন্দে, ঘন ডালপালার আলো-আঁধারিতে কতশত পাখপাখালি, সাপখোপ, কীটপতঙ্গ গড়ে রেখেছে শত বছরের নিবাস। এই বট ওদের জন্মভূমি। বিচরণের অভয়ারণ্য। নিঃঝুম রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এই বট রচনা করে তার নিজস্ব জীবজগতের নৈশ মেলার আসর। নিশাচর পাখি, জোনাকি, ঝিঁঝি আর তাবৎ বাচাল কীটপতঙ্গদের নৈশ সঙ্গীতে মাতোয়ারা হয় এই বটের অরণ্য আর তার আশপাশ। দেশান্তরী পাখপাখালি কত দূরের মুলুক থেকে উড়ে আসে। বটের মগডালের চাতালে ঘন ডালপালা আর পত্রভূমির উপত্যকায় গড়ে তোলে শীতের নিবাস। এখানে জন্মায় বংশধর। এখানের ডালে ডালে লাফায় পক্ষীশিশু। ক্রমে তারা বড় হয়, শিক্ষিত হয়ে উঠে জীবনধারণের নানাবিধ কলাকৌশলে। তারপর গ্রীষ্মের প্রাক্কালে দল বেঁধে উড়ে যায় অন্য গন্তব্যে। শত অনটনেও যেন এই বটের গায়ে হাত দিসনি বাপ! কেড়ে নিসনে কখনও ওদের এই প্রাচীন নিবাস!

কেমন করে যেন আবার ঘুরতে শুরু করে রমেনদের মরচে ধরা ভাগ্যের চাকা। দোলন বৌয়ের কোল জুড়ে বসে শুভ্র স্নিগ্ধ যমজ শিশুর মেলা। হাটে রমেনের লুঙ্গি-গামছার কারবারের পালে লাগে মা লক্ষ্মীর

দাক্ষিণ্যের হাওয়া। দু'দুটো দুধেল গাভীর দুধে সকাল-বিকেল যেন বান ডাকে! বাড়ীর পাশের দুফালি জমিতে এবার দিয়েছিল মাঘী সরষে। সেখানেও মরসুমে বয়ে যায় সবুজ হলুদের বান।

হালদার বাড়ীর ভাগ্যের পালা বদলের শুভাকাঙ্খী যেমন অনেক, তেমনি নিন্দুকেরও অভাব হল না মোটেও। এবাড়ী ওবাড়ী কানাঘুষো। হালদার বংশের নিভে আসা প্রদীপ রমেন হালদারের কপাল ফিরেছে, এও কি সয়! হিংসায় জ্বলে মরছে জ্ঞাতি'শত্রু ভোলা বাঁড়ুজ্যে। দেবতার বরটরের গল্প নাকি হালদারদের মিথ্যাচার, ভাঁওতাবাজি। একদিন সে রাজ্যের মানুষ জড়ো করে বুক চিতিয়ে বলেই বসল, দেখাচ্ছি আজ হালদারদের জারিজুরি। টারজান স্টাইলে লাফিয়ে লাফিয়ে এ-ঝুরি ও-ঝুরি হয়ে তরতর করে উঠে গেল সে বটের উঁচু ডালে। তেলাপিয়া রহস্য অভিযানে দ্রুত অদৃশ্য হল ঘন বটপত্রের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। অনেকখানি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভোলার নেমে আসার নাম নেই। নৈশঃব্দে স্থির হয়ে আছে বটের মূলে অপেক্ষমান জনতার ভিড়। কী করছে ভোলা এতক্ষণ দুর্গম বটের গহীন গভীরে! এক ঝাঁক হাড়গিলে ব্যস্ত হয়ে ডানা মেলে উঠে পড়ল বটের শীর্ষ ছেড়ে। ত্রস্তে পাখা ঝাপটে উড়ে গেল তারা, খাল পেরিয়ে, তমাল বনের পাশ কাটিয়ে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় শিউরে ওঠে মানুষ। ঠিক তখনই, ধপাস করে বটের মূলে আছড়ে পড়ল ভোলার শরীর। মুখে ফেনা তুলে, হাতেপায়ে খিঁচুনি দিয়ে, ছটফট করতে করতে সবার চোখের সামনে ভোলার বিশাল দেহটি স্থির হয়ে গেল। এক প্রবীন এগিয়ে এসে পরখ করে বললেন – কালনাগিনীর কোপ। এমন ঔদ্ধত্য কী দেবতার সয়? তেনাদের সাথে দাদাগিরি? বলে তিনি চোখ মুদে জোড়া হাত উপরে তুলে অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। ভোলার মরদেহের সৎকার শেষে দল বেঁধে শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল হালদারদের বটমূলে। জল দিয়ে ফুল দিয়ে পুজো দিল প্রস্থে প্রস্থে। পূজারীরা বাড়ী বয়ে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গেল দোলন বৌকে। ভক্তিতে বুঁদ হয়ে বসে রইল তারা দোলন বৌয়ের পায়ের কাছটিতে। রোগ-শোক-বিপদ থেকে সুরক্ষা দাও মা-জননী। প্রতিষ্ঠিত হলো হালদারদের বটবৃক্ষের তেলাপিয়ার মিথ।

******

কালে কালে পুরোনো বটের প্রশস্ত কাণ্ডের ভিতরে ক্ষয়ে যাওয়া বিশাল গর্তে বৃষ্টির জলে সৃষ্টি হয়েছে গভীর জলাধার। সেখানেই সে দেখে এসেছে তাদের। ঐ বিশাল বটের গোপন গুহায় সত্যিই গড়ে উঠেছে এক তেলাপিয়া উপনিবেশ। ঝাঁকে ঝাঁকে, ক্ষুদ্র পোনা থেকে মাঝারি, বৃহৎ এবং প্রবীণ, গুচ্ছের তেলাপিয়া। রহস্য শুধু এটুকুই, ওখানে ঐ অত উঁচুতে গহীন বটের গহ্বরে তেলাপিয়ার আবির্ভাব হল কেমন করে? রমেন হালদার ভেবে বের করেছে, ভূমিতল থেকে বটবৃক্ষের ঐ উচ্চতায় তেলাপিয়া মাইগ্রেশনের এক সম্ভাব্য পটভূমি। হয়তো একদা কোনো তৃষ্ণার্ত কাক কিংবা বক পাখি আশেপাশের ডোবা-নালায় জল পান করে উড়ে গিয়ে বসেছিল ঐ বটের ডালে, কোনো ভাবে বয়ে এনেছিল কিছু পরিপক্ক তেলাপিয়ার ডিম। তা থেকেই উৎপত্তি আর কালে কালে বংশবিস্তার। বর্ষার মৌসুমে ঝড়বৃষ্টির তোড়ে বটবৃক্ষস্থ জলাশয়ে যখন বয় জলোচ্ছ্বাস, তখনই বুঝি বিপথগামী হয় কিছু বানভাসী তেলাপিয়া। তাদেরই দু'একটা নেমে আসে গুঁড়ি বেয়ে একেবারে বটের গোড়া পর্যন্ত। বাস্তবতার নিরিখে এটাই হতে পারে বটবৃক্ষে তেলাপিয়ার সম্ভাব্য পটভূমি।

কিন্তু দোলন বৌকে সে কথা বোঝায় কার সাধ্যি? তার কাছে তো এই তেলাপিয়া প্রগাঢ় রহস্যে ঘেরা। স্বর্গবাসী দেবতার বর বিশেষ। এই তেলাপিয়াকে ঘিরে তার মনে বাসা বেঁধেছে এক গভীর প্রত্যাশা আর নিবিড় বিশ্বাসবোধ। তার বিশ্বাস ভগবান না জানি তাকে কোন পুণ্যের বর দিয়েছে। এই নতুন ভাবনা দোলন বৌকে উদ্বেলিত করে রাখে অহর্নিশি। স্বর্গপ্রেরিত এই তেলাপিয়ায় কি আছে ধরাতলের তাবৎ দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম? প্রসবোন্মুখ নারীর দুর্বহ প্রসববেদনার অলৌকিক নিরাময়? মানবজাতির কোন দুর্বিনীত সমস্যার স্বর্গীয় সমাধান?

সেই থেকে বড় রহস্যঘেরা হয়ে রইল এই বটবৃক্ষ আর তার গর্ভোৎসারিত ঐশ্বরিক তেলাপিয়া! সেই থেকে ফি-বছর বৈশাখী অমাবস্যার ভোরে হালদারদের বটমূলে নামে হাজার মানুষের ঢল। উৎসবমুখর হয়ে উঠে শ্রীধরপুর গ্রাম। বট অরণ্যের চারপাশ ঘিরে রাতারাতি গড়ে ওঠে শতেক দোকানপাট। বায়োস্কোপ, সার্কাস, পুতুলনাচ, মন্ডা-মিঠাইয়ে মেলা জমজমাট থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে মানুষ। অসুস্থরা আসে দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম কামনায়। নিঃসন্তান রমণীরা গোপনে ব্যক্ত করে সন্তানবতী হওয়ার আকুল বাসনা। এমনি আরও কত মানুষ মনের গভীরে লুক্কায়িত কামনায় বটমূলে উপবিষ্ট ধ্যানগম্ভীর দোলন বৌয়ের হাতের এক লোকমা তেলাপিয়া-অন্ন মুখে পুরে ফিরে যায় পর্বতপ্রমাণ প্রত্যাশা বুকে নিয়ে। কেউ কিছু ফল পায়, কেউ পায় না। যাদের হয়, তারা সেই অলৌকিক নিরাময়ের কথা ছড়িয়ে দেয় দূর থেকে দূরান্তরে। যাদের হয় না, তাদের খবর কে-ই বা রাখে।

দিন মাস বছর ঘুরে ফিরে আসে। দোলন বৌয়ের বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়, তার হাতে দেবতারা গচ্ছিত রেখেছেন মানুষের মঙ্গল। অঝোর বর্ষণের রাতে স্বর্গরাজ্যের কোন অজানা বহতা নদীর তীর্থ ছেড়ে ঘন বটের বন পেরিয়ে ভূতলে নেমে আসে যে আত্মত্যাগী তেলাপিয়া, তারাই সেই মঙ্গলের বাহন। দোলন বৌয়ের গভীর প্রত্যয় দিনমান তার স্নিগ্ধ শুভ্র অবয়বে মাখিয়ে রাখে স্বর্গীয় আবীরের ছটা। রমেন সারাদিন ভাবে। ভেবে ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কি ভাবে কী হয়, রমেন সেসব বোঝে না। হয়তো মানুষের মনস্তত্ত্ব, বিশ্বাস আর আস্থার সাথে নিবিড় কোন যোগাযোগ আছে তার শারীরিক রসায়নের। রোগ-ব্যাধি, সুখ-দুঃখ, হতাশা, বিষাদ, তৃপ্তি, অবসাদ, সবই বুঝি সেই শারীরিক রসায়ন-নিয়ন্ত্রিত অবস্থা বিশেষ। বটবৃক্ষের তেলাপিয়ার উৎস-রহস্য তো রমেন হালদারের অজানা নয়। তবু যেন দোলন বৌয়ের প্রগাঢ় বিশ্বাসকে গুঁড়িয়ে দিতে মন চায় না তার। নিশিদিন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে সে। দোলনের অলৌকিক তেলাপিয়াদের অমঙ্গল চিন্তায় তার মনপ্রাণ অস্থির হয়ে থাকে। তার ভয়, যদি কোনোদিন শুকিয়ে যায় এই বটের গুপ্ত জলাধার! যদি কোনো নির্দয় খরা এসে শুষে নেয় বট গর্ভের সঞ্চিত সবটুকু জল। যদি তেলাপিয়ারা এককালীন নির্ব্বংশ হয়ে যায় কোনো বিষধর সর্পের দংশনে! কোনোদিন বৃষ্টিস্নাত ভিজে বটের গুঁড়ি বেয়ে ছটফটে রূপালী তেলাপিয়ারা যদি আর ফিরে না আসে!